Journal of Gono Bishwabidyalay
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)
Journal Homepage: https://gonouniversity.edu.bd/research/journal-of-gb/

Original Research

হৃদয়ের অন্তর্জগতে নিত্য প্রবাহিত সমুদ্রের আখ্যানকাব্য : হাত হদাই

আয়েশা সিদ্দিকা[১]*

[১]বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, নলাম, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।
* Corresponding Author: আয়েশা সিদ্দিকা, ই-মেইল : ayashasiddika.bangla@gmail.com; মোবাইলঃ +৮৮০১৭১২৫৫০৫৭৭
Received: 06/02/2024; Accepted: 09/08/2024; Online available: 30/09/2024

সার-সংক্ষেপ

সেলিম আল দীন রচিত হাত হদাই বাংলা নাট্যধারায় প্রবর্তিত কথানাট্য ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এ নাটকে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার ছন্দেই চিত্রিত হয়েছে উপকূলীয় মানুষদের জীবন সংগ্রাম। নাট্যকার সাত সওদা বা সপ্ত বাণিজ্য অর্থে হাত হদাই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তবে নাটকে আনার ভাণ্ডারি সমুদ্র ভ্রমণের মাত্র দুটি গল্প বলেছে। সেই অর্থে সাত বাণিজ্যের গল্প এখানে অনুপস্থিত। নাটকটি গভীর অনুধ্যানে দেখা যায় নানা রকমের সওদার ভেতর দিয়েই জীবনের প্রতিটি স্তর মানুষ পার করে। সত্যিকার অর্থে মানবজীবনের পুরোটা জুড়েই আছে নানা বাণিজ্য। ভাবগত অর্থে আলোচ্য নাটকের প্রতিটি চরিত্রই জাগতিক বস্তুগত বাণিজ্যের থেকেও বৃহৎ জীবনবাণিজ্যে নিয়োজিত। আর বাণিজ্য থাকলে সেখানে হিসাব-নিকাশ অনিবার্য। এই লেন-দেনের কারবারে মনের গভীরতম তলদেশে জমতে থাকে বাষ্প। বয়সের সাথে সাথে হৃদয়ের অভ্যন্তরে জমে ওঠা নোনা জল বাড়তে থাকে। সংগ্রাম ও সংক্ষুদ্ধ জীবনযুদ্ধ বুকের ভেতরের জমা জলকে সমুদ্রে পরিণত করে। তাকে বহন করেই সমুদ্র উপকূলীয় জীবনকাঠামোতে প্রতিটি মানুষকেই সাহসের সঙ্গে প্রাকৃতিক, সামাজিক দূর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। এই নাটকের আনার, জামাল, চুক্কুনী, আঙ্কুরী, হাস্না, নাড়ু, বেগমী, ছিদ্দা, মালু হাবেজ, ইদ্রিস সবার জীবনেই অন্তর্লীন রয়েছে গভীর এক সমুদ্র। বৃহৎ অর্থে জীবনভর নানা সওদার মধ্যে দিয়েই বিশ্বভূগোলের মানুষেরা পাড়ি দিয়ে চলেছে জীবন-সমুদ্র। বক্ষমান প্রবন্ধে হাত হদাই নাটকের চরিত্রগুলো অন্তর-চেতনায় সমুদ্রকে বহন করেও যাপিত জীবনে কতটা দক্ষ নাবিক হয়ে উঠেছে তা অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে।

মূল শব্দ সূচক : হৃদয়, অন্তর্জগত, সমুদ্র, আখ্যানকাব্য, হাত হদাই

স্বাধীনতা-যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব সেলিম আল দীন। তিনি বাংলার হাজার বছরের কৃষ্টি-ঐতিহ্যকে স্বকীয় ধ্যান-ধারণা, ভাবনা, মেধা-মননের সঙ্গে অঙ্গীকৃত করে সৃজন করেছেন স্বতন্ত্র নাট্যভুবন। মহাকাব্যিক বিস্তারে তিনি নাটকে ব্যক্ত করেছেন বাঙালির একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতি, জীবনবোধ, বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম ও সমাজ-বাস্তবতা। বাবার বদলি-চাকরির কারণে তিনি ছোটবেলাতেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রার নিগুঢ় বাস্তবতা খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে শৈশবের সেই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা যুক্ত করেছেন তাঁর সৃজন-সম্ভারে। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ফেনি জেলার সেনেরখিল গ্রামে ১৯৪৯ সালের ১৮ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন নাট্যকার সেলিম আল দীন। ফেনি-নোয়াখালী অঞ্চলে বসবাসরত মানুষদের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে তিনি আশৈশব পরিচিত। ডাঙ্গার মানুষদের সঙ্গে যাপিত জীবনপদ্ধতি ও দর্শন জলঘেঁষে বেড়ে ওঠা মানুষদের যে একবারেই ভিন্ন, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষ হিসেবে ঋতু বিশেষের পরিবর্তন, আকাশে মেঘের অবস্থান, বাতাসের গতি বুঝে নিতে নিতেই প্রকৃতিসংলগ্ন হয়ে বেড়ে উঠেছিলেন নাট্যকার সেলিম আল দীন। শৈশবে দেখা সমুদ্রতীরবর্তী মানুষের বিচিত্র পেশা ও বৈচিত্র্যময় জীবন, অর্থনৈতিক সংগ্রামে পর্যুদস্ত নাবিকের নোনাজলে ভেসে যাওয়া ও ফিরে আসা, তাদের গার্হস্থ্যজীবন-সংস্কার ও সমুদ্রের জোয়ার-ভাটায় বাঁধা রুচি-সংস্কৃতি-ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই সেলিম আল দীন ১৯৮৭-৮৯ কালপরিসরে রচনা করেন *হাত-হদাই*। উক্ত নাটকের পরিশিষ্টে নাট্যকার নিজেই উল্লেখ করেছেন, "হাত হদাই কাহিনী বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জনপদ থেকে গৃহীত। সে অঞ্চল আমার পিতৃভূমি।[১]" আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সমুদ্র। ফেনি-নোয়াখালীর বিস্তীর্ণ চরের কূলঘেঁষে বঙ্গোপসাগর হয়ে কখনো থাইল্যান্ড, মিশরের বন্দর, ব্রাজিলের রিওডি জেনেরোর সুগারলোফ মাউন্টেন পর্যন্ত ব্যাপ্তি পেয়েছে এ নাটকের গল্প। সেই সঙ্গে আনার ভাণ্ডারি, মোদু, ডিঙ্গা, ইদ্রিছ, হাস্না, বেগমী, ছিদ্দা, জামাল, মছলন শা, মালু হাবেজ, হার্মাদের ঘাটের মাঝি সিরাজ ও জলবেশ্যা সকিনা, লুত্তা, চুক্কুনী, নাড়ু, ইদ্রিস, লেদন, আঙ্কুরী নামের অসংখ্য মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে নাটকের প্রাঙ্গণ।

---

১. *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৩, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. পরিশিষ্ট*

আঙ্গিক, বিষয় ও জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্যে সেলিম আল দীনের প্রতিটি নাটকই অনন্য। তিনি বর্ণনাত্মক নাট্যআঙ্গিকে *কিত্তনখোলা*, *কেরামতমঙ্গল*-এর পর সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে গড়ে ওঠা জগতকে একসুতোয় গেঁথে রচনা করলেন *হাত হদাই*। বাংলাদেশের সন্দ্বীপ, চর বামনী, চরটুবা, চরচান্দিয়া, চরগাজী, চরবাউরিয়া, চরকাসিম, চরমাস্তুল, চরখোয়াজ, চরজাকিয়া, চর তমিরুদ্দি, হাসনগঞ্জ, পীরবক্স, বাংলা বাজার খুলনা, সুন্দরবন, চানপুর, কাজীর হাট, ইজ্জতপুর, মুছুয়া দোনার খাল, তাল মোহাম্মদের হাট, ফাজিলার ঘাট, কাড়াখালি, ওলমার হাট, গোয়ালন্দ থেকে এ নাটকের আখ্যান বিস্তৃতি পেয়েছে বার্সিলোনা, রেওডিজেনিরো, চিলি, পর্তুগাল, ভালেত্তি, সিসিলি, মাল্টা, নিউগিনি, ইস্তাম্বুল, ব্যঙ্কক, মাদ্রাজ, বার্মা, রেঙ্গুন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের রঙ-বেরঙের শহরে-বন্দরে। বাংলাদেশের মানচিত্র অতিক্রম করে এক একটি চরিত্র যেন এক একটি আখ্যান সঙ্গে নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বের হয়েছে। একটি বিশাল অঞ্চলের বিস্তীর্ণ পরিবেশ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বভূগোলের নানা স্থানে। সমুদ্র পাড়ের মানুষের জীবন নিস্তরঙ্গ হতে পারে না। বিশাল ঢেউয়ের ওঠা-নামার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে যারা বেড়ে উঠেছে, তাদের জীবনও তরঙ্গসংকুল হবে এটাই স্বাভাবিক। এদের কেউ মাছ ধরে জীবন নির্বাহ করে কেউ বা চর দখলের যোদ্ধা হিসেবে ভাড়া খাটে আর কেউ কেউ জাহাজে চাকরী নিয়ে সমুদ্রে ভেসে যায়। আলোচ্য নাটকে আনার ভাণ্ডারির নাবিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, জীবন সম্পর্কে তাঁর ভালোবাসা-আবেগ, বেঁচে থাকার ইচ্ছার সমান্তরালে চর জীবনের উৎসব, আচার-বিধি, আর্থ-সামাজিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। সেলিম আল দীনের *শকুন্তলা*-পরবর্তী প্রতিটি নাটকেই গ্রাম-বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া ও অস্তিত্বের সংগ্রামে পর্যুদস্ত প্রান্তিক মানুষের জীবনবাস্তবতা মহাকব্যিক বিস্তারে উপস্থাপিত হয়েছে। *শকুন্তলা* নাটকের গল্পটি খণ্ডে বিভাজিত, আবার বিষয় ও আখ্যানের প্রয়োজনে *কিত্তনখোলার* নাট্যবৃত্ত স্বর্গে বিভাজিত, *কেরামত মঙ্গলের* নাট্যআখ্যান আবার বারোটি খণ্ডে বিভক্ত। এ নাটকে পুরাণে বর্ণিত সাতটি নরকের অনুরূপ পৃথিবীতেও মানুষের অত্যাচার-অমানবিকতার দ্বারা সৃষ্ট নারকীয় ভূবনের চিত্র বারোটি খণ্ডে রূপায়িত হয়েছে। আর *হাত হদাই* নাটকের কাহিনি সজ্জিত হয়েছে জোয়ার-ভাটাকে কেন্দ্র করে। নাটকটি পনেরো পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলোর মধ্যে অনেক উপ-পর্ব রয়েছে। প্রতিটি খণ্ডের প্রথমেই জোয়ার-ভাটার সময়ের হিসেবে উল্লেখ করেছেন নাট্যকার। যেমন : "এক/ জোয়ার। দুপুর ১২-২৮-২৯ ও রাত্রি ১২-৬-২৮/ ভাটা। সকাল ৭-৮-৫০ ও রাত্রি ৪-৫৬-১৫[২]" মোট একুশটি জোয়ার ও উনিশটি ভাটার মধ্যে দিয়ে আলোচ্য নাটকটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে মানুষের জীবন-কর্ম। যেহেতু নাট্যকাহিনিটি চরবাসী লোকদের, সেহেতু জোয়ার-ভাটার নিয়ন্ত্রণে গল্প উপস্থাপন নাট্যকারের বিচক্ষণতার পরিচয়। পুরো নাটক জুড়ে আছে মানুষের জন্ম-মৃত্যু ও জীবনবোধ সম্পর্কিত নানা দর্শন।

হাত হদাই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র আনার ভাণ্ডারি, যাপিত জীবনে যার কাছে উৎসবটাই বড়ো কথা। গল্পের শুরুতেই চরাঞ্চলের উৎসবের আবহ পাওয়া যায় 'চর চান্দিয়ার মাছুয়া'দের 'ছোটফেণী গাঙের পাড়ে' আয়োজিত নৃত্য-গীত থেকে। এর মধ্যে আনার ভাণ্ডারি ভেড়া বাঁধার দড়ি নিয়ে গানের তালে তালে নাচতে নাচতে প্রবেশ করে। বাহ্যিক বয়স বাড়লেও মনের দিক থেকে তিনি তরুণ, নিজেই বলেছেন, "ইয়ংম্যান এইজ চিক্সটি ফোর।[৩]" পঁয়ত্রিশ বছর সাগরে ভেসে বেড়িয়ে বড় ছেলে ছিদ্দা ও তাঁর স্ত্রী বেগমীর সংসারে স্থায়ী হয়েছে আনার। দু'-দুবার বিয়ে করলেও দুই স্ত্রীই গত হয়েছে। ছোট ছেলে জামাল জলদস্যু হয়েছে 'আনচু হদ্দার'-এর দলে যোগ দিয়ে। পুরোনো অদৃশ্য বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলতে গিয়ে আনার কখনো রেগে যায়, কখনো খুশি হয়ে ওঠে। মাঝি-মল্লার গান, চর দখলের লড়াই, তাদের হৈ-হুল্লোড় ও উঁচুস্বরের কথা-বার্তা, কাইটে কাইটে পাইট (ঘুড়ি ওড়ানো), ডেঙ্গুইরা পাখি শিকার, মোরগ লড়াই, ভেড়ার লড়াই, বলি খেলা, চাঁইয়া চিংড়ি মাছ শিকার, খিজির নবীর জারিগান-প্রভৃতি উৎসবের আমেজ নাটকের মর্মে মর্মে ছড়িয়ে আছে। এরই মধ্যে ফুর্তিবাজ মানুষ আনারের মনের কোণে ঝিলিক দিয়ে যায় মৃত্যুচিন্তা। মছলন শাহের কাছে সে তওবা করে, তওবার পরপরই কিছুদিন ঝিম মেরে থাকে। চরের বিভিন্ন উৎসবে তাঁকে ডাকা হলে, সে তওবার পর প্রথম কিছুদিন আনন্দ-ফুর্তিতে উৎসাহ না দেখিয়ে বলে "আঁরে আর এগানের মাইধে ডাকিসনারে মোদু।–এইবার গাঙ পার হওনের কড়ি জমাইতাম চাই।[৪]" কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনযাপনের কোন পর্যায়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজের কোন পাপ, অন্যায় সে খুঁজে পায় না। জীবন-রসিক আনার বাঁচতে ভালোবাসে। পৃথিবীর যাবতীয় আনন্দ সে উপভোগ করতে সদা উৎসুখ। তাইতো কিছুদিন যেতেই জগৎ সংসারের সুখ-দুখের লীলা, তাসের প্যাকেট, ক্ষেত-খামার তার তওবা ভেঙে দেয়। "তৌবা করি কিন্তু আবার রক্তে রক্তে কি খেলা শুরু অয়–আবার ভাঙ্গি।[৫]" ভাদ্রমাসে ইমাম সাহেবের কাছে তওবা করে নাচ-গান, তাস খেলা বন্ধ করে দেয় আনার, নামাজ-কালামে মন দেয়, কিন্তু নাড়ুর ছেলের মুসলমানিতে পায়ে ঘুঙুর পরে নেচে সে তওবা ভাঙে। মাঘ মাস জুড়ে বাতের ব্যথায় কষ্ট পেয়ে আবার তওবা করে ফাল্গুন মাসে হাডুডু খেলার দিন আবার তওবা ভেঙে ফেলেন।

২. সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৩, পৃ. ৫৮
৩ সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৩, পৃ. ৫৯
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

চরের প্রকৃতিই ভাঙ্গা-গড়ার। এখানকার জীবনে উৎসব ক্ষণস্থায়ী। আনারকে ঘিরে গল্পের ভেতরে উঠে আসে আরো অসংখ্য চরিত্র। লেদন, ইদ্রিস, চর দখলের লাঠিয়াল নাড়ু, মোদু, হাস্না, চুক্কুনী, বর্মী মেয়ে মসিনু, আইব্বা, শামা মাঝি, ডিঙ্গা, হাইশশা, লুত্তা, ইন্তু, মোমিন, বেগমী, ছিদ্দা, মছলন শা, মালু হাবেজ, সকিনা, আঙ্কুরী প্রমুখ চরিত্র উপকূলীয় নোনাজল হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে চলে যার যার নিজের জীবনের পথে। জীবন তো বহমান। একদিকে বিস্তৃত জলরাশি, অন্য দিকে ধু ধু চর। জোয়ার-ভাটার নোনা জলে চলে এদের জীবন-সংগ্রাম। এদের সবারই গল্প আলাদা আলাদা, তবে একই সূত্রে বাঁধা। জন্মের পর থেকেই নিরন্তর সংগ্রাম ও মৃত্যুকে হাতে নিয়ে দেখে বলেই হয়তো উপকূলবাসী জীবনবাদী। চরের সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন যে মালু হাবেজ, অসুস্থ হওয়ার পরে তার মুখেই প্রতিধ্বনিত হয় : “না না না–ভাণ্ডারি সাব–মরণের কথা কইয়ে না। আইজ হে কথা কই না – যে কথা এতদিন মাইনষেরে কইছি। কিন্তু আঁই যদি আর কোগা দিন বাঁইচতাম। মাত্র গেল শীতে নতুন বিয়া কইরছি–আট কানি চাষের জমি–থুই যাইতে মন সরে না।[৬]” যে মানুষ নিজেই এত দিন চরের লোকদের ইহকাল-পরকালের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে দিয়েছে, আজ তারই জীবনের সকল আয়োজনের মধ্যে মৃত্যু এক চরম অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু। আসলে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মানুষের পার্থিব জীবনের প্রতি ভালোবাসা চিরন্তন। আলোচ্য নাটকের আরেকটি চরিত্র চুক্কুনী, একটি গভীর সমুদ্র বুকের ভেতরে ধারণ করে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন চরে জীবন খুঁজে ফেরা এক নারী। অত্যাচারের চিহ্ন শরীরে বহন করে খেলাধন মাঝির তৃতীয় স্ত্রী চুক্কুনী বিয়ের বছর না ঘুরতেই ফিরে আসে নিজের বাড়ি। তারপর ঘর-সংসার-সন্তানের স্বপ্ন চুক্কুনীকে চরে স্থির হতে দেয় না। নারীমনের স্বপ্নপুরণের হাতছানিতে নানা চরে বেশ্যার জীবন কাটিয়ে আবারও সে বাড়ি ফিরে আসে, তবে সঙ্গে নিয়ে আসে মরণব্যাধী। মৃত্যুশয্যায় চুক্কুনী দুই বিয়ের দুটি হাজনি শাড়ি বুকে জড়িয়ে নারীজীবনে নষ্ট হবার, বঞ্চনার কষ্ট ভুলতে চায়, পুরোনো দিনের সুখস্মৃতি রোমন্থন করে বলতে থাকে – “আছে আছে–গন্ধ আছে–সুখ আছে–রঙ আছে।[৭]” আবার শিকার করে জীবন নির্বাহ করে যে নারু গারুই, সেও নিজের মৃত বড় ভায়ের শেষকৃত্যের পরপরই সীতা বৌদিকে নিয়ে ঘর বাঁধার উদ্দেশ্যে সামাজিক বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে চর ছাড়ে। জীবনের প্রতি আসক্তির এও এক বিশিষ্ট উদাহরণ। অসীম সাগরের বহমানতার একটা উদ্দাম গতি আছে, সমুদ্র উপকূলীয় মানুষদের জীবনকাঠামোতে সেই গতিময়তার স্পর্শ থাকবে তা স্বাভাবিক। জীবনের অবিশ্রান্ত গতিময়তার এক শৈল্পিক প্রকাশ *হাত হদাই*। এ নাটকে প্রতিটির চরিত্রের ভেতরেই পাপপূণ্যের ধারণার উর্ধ্বে উঠে মৃত্যুর বিকলতাকে পেছনে ফেলে বাঁচার আনন্দটুকু গ্রহণ করে সামনে এগিয়ে চলার প্রত্যয় স্পষ্ট। আনার ভাণ্ডারিও জীবনপ্রেমিক। অবলীলায় সে স্বীকার করেছে – “কিছু গুছাই উইঠতাম হারিন – চৌষট্টি বোছর বয়স। অনও তবনের নিচে থির থির করি কাঁপি উডে – মাইয়া মানষ দেইখলে হু হু করি উডে বুক। রিওডি জেনিরোর এলিনা – ভালেত্তির লোত্তে – ব্যাঙ্ককের উঙ্গ কেপটাউনের মণিকা–জিহ্বা মরে না–টকঝাল খুঁজে। গান বাজনার আবাজ–তৌবার পরতুন দেখি কোন বেশকম নাই – আগে যেমন বাইজতো–অনও বাজে। মরণের কথা মনে থাকে না।[৮]” আবার মছলন শাহর বুদ্ধিতে কাফনের কাপড় কিনে আনার ভাণ্ডারির একমাস পর তা দিয়ে আবার নিজের জামা বানিয়ে ফেলা অথবা হার্মাদের ঘাটে জলবেশ্যা সকিনার সঙ্গে সম্ভোগ, রাতের অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতে মাটি দিয়ে কবর ভরাট করে দেওয়া আপাত দৃষ্টিতে অসংলগ্ন মনে হলেও এ সবই ভালোবাসা, জীবনের জন্য মমত্ববোধ। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাই বিশ্বমানবের অন্তর্জগতের গূঢ়তম সত্য। তাইতো বলা যায় মৃত্যুর স্থবিরতার বিপরীতে জীবনকে ভালোবাসার, জয় করে নেওয়ার নাটক *হাত হদাই*।

আলোচ্য নাটকে আনার ভাণ্ডারির মতো সাগর ভাসা হয়ে দেশান্তরী হয়ে পড়া আরেক নাম মোদু। ভাগ্যের অন্বেষণে অমানবিক জীবনের পর্যায় পার হয়ে বর্তমানে থাইল্যান্ডে বিয়ে করে স্থায়ী হয়েছে সে। নাটকে দেখা যায় আনার ভাণ্ডারির চিঠি পেয়ে সে চরে ফিরে এসেছে। তার অন্তরে দ্বন্দ্ব, একদিকে ব্যাঙ্ককে রেখে আসা বিদেশী স্ত্রী মাসিনুর জন্য ভালোবাসা, অন্যদিকে এবারে নিজের দেশ তথা চরাঞ্চলে নিজের ভিটেতে ফিরে হাস্না নামের একটি মেয়ে তাকে নতুনভাবে আকর্ষণ করেছে। একবার ভাবে হাস্নাকে বিয়ে করে দেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করবে, কিন্তু পারে না। মোদুর অন্তরে প্রবাহিত সমুদ্র তাই গর্জন করে ওঠে, “ও কাগা – ও কাগা সুখ পাইনা – সুখ পাইনা জনমে। হেই কবে ঘর ছাড়ি চলি গেলাম – কোন দূর দেশে – কত চেংখি – খিদিরপুর – রেঙ্গুম – ব্যাংক–জনম ভরি সাগর বাড়ে – থাই সাগরে রোলিং উডে – বঙ্গমসাগরে তুফান ছুডে।[৯]” কিন্তু জীবনের বাঁকবদল কি এতই সহজ? “বিশ তিরিশ বোছর ধরি যে – জীবন যে-হোঁতে চলে – তারে বদলান কি এত সহজ।[১০]” শেষ পর্যন্ত মোদু ফিরে যায় ব্যাঙ্ককে, হাস্নাও বউ হয়ে চর ইঞ্জিমানের নওশের মিয়ার বড় ছেলের সংসারে পাড়ি জমায়। এভাবেই জীবন পরিণতি প্রাপ্ত হতে থাকে।

৬. *পূর্বোক্ত*, *পৃ.* ১৭২
৭. *পূর্বোক্ত*, *পৃ.* ১৭০
৮. *পূর্বোক্ত*, *পৃ.*১৩৪
৯. *পূর্বোক্ত*, *পৃ.*১৩৮
১০. *পূর্বোক্ত*, *পৃ.*১৩৯

আনার ভাণ্ডারি প্রাণোচ্ছল মুক্তজীবনের প্রতীক। নানামুখি ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে আনার তবু ভেঙে পড়ে না। সে অসুস্থ হলে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জমিলার ছোটবোন আঙ্কুরী চরটুবা থেকে তাকে দেখতে আসে। আঙ্কুরীও পোড় খাওয়া এক নারী। সাগর যার স্বামী-সন্তান সব কেড়ে নিয়েছে। সেই সমুদ্রের পাড়েই বুকের নোনাজল সঙ্গী করে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন তার। আঙ্কুরীকে সমুদ্রজীবনের গল্প শোনাতে শোনাতে আনার ভাণ্ডারির আবারও জীবনতৃষ্ণা তীব্র হয়ে ওঠে। নিঃসঙ্গ আনারের মনে শ্যালিকা আঙ্কুরীর সঙ্গ পাওয়ার আকাংখা তীব্র হয়ে ওঠে। গভীর চরের জমিদার বাড়ির পাড়-ভাঙা পুকুর থেকে পাওয়া টিকলিটা সে আঙ্কুরীকে দেয়। বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছাতে আনার নিজের খোড়া কবর নিজেই রাতে অন্ধকারে বুজিয়ে দিয়েছে সে সত্য নিজেই আঙ্কুরীর কাছে স্বিকার করে। তাঁর ভালোবাসা গ্রহণ করে আঙ্কুরী। আনারের সঙ্গে আবার এই বাড়িতে ফিরে আসার শর্তে নাতী ইন্তকে সঙ্গে নিয়ে দুইজন আবার এক ভরা জোয়ারে সমুদ্রের বুকে নৌকায় ভাসে। একাকীত্বের জীবনে একজন আরেকজনকে আঁকড়ে ধরে প্রাচীন ও প্রবীণ জীবনকে সার্থক করে তোলার প্রত্যয় নিয়েই শেষ হয়েছে *হাত হদাই*।

সেলিম আল দীন রচিত *হাত হদাই* নাটকে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন-পিপাসার পাশাপাশি তাঁদের সংগ্রাম, কষ্টভোগের দৃশ্যকল্পও উন্মোচিত হয়েছে। জগত-সংসার পারাপারে সুখ-দুখের খেলা মানুষকে কখনও জয়ের আনন্দে আপ্লুত করে আবার কখনও পরাজয়ের গ্লানিতে ডুবিয়ে দেয়। তবে প্রতিটি মানুষই এক এক জন যোদ্ধা। হাত হদাই নাটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন স্বাপ্নিক মানুষেরা সমস্ত দুঃখ কষ্টের পরও বাঁচতে ভালোবাসে। জীবনের প্রতি মরণশীল মানুষের এই ভালোবাসা চিরন্তন। "এ নাটক আসলে এক ভালোবাসার নাটক, জীবনের মৃত্যুকে ভালোবাসার, ডাঙার সমুদ্রকে ভালোবাসার, স্থিতির গতিকে ভালোবাসার এবং বঞ্চনার হয়তো-বা কল্পনাময় জীবনকে ভালোবাসার।[১১]" পাপপুণ্যের ধারণাকে বাদ দিয়ে জীবনসুধার সম্পূর্ণ নির্যাস গ্রহণের আকুতির এক শৈল্পিক প্রকাশ আনার ভাণ্ডারি। "এই নাটকে আরব্য রজনীর গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ী গল্পরীতির সঙ্গে সুফী তাত্ত্বিক দেহবাদ আশ্রয়ে জীবন দর্শনের প্রাচ্য রূপ ধৃত হয়েছে। দেহবাদে বলা হয় মানব দেহে সপ্ত সমুদ্র হাতের ভাগ্যরেখা অসংখ্য নদী নালার মতো। মানুষ সেই ভাগ্যের নদী অতিক্রম করতে চায় বার বার।[১২]" অথচ জীবন এক জটিল ধাঁধা। নিজের গণ্ডি ছেড়ে দূরে গিয়েও কি জীবনবদল ঘটানো যায়? *কিত্তনখোলা* নাটকে দেখা যায় এক জীবনে নানা রূপান্তরের যে সাক্ষী মানুষ, তারই প্রতিনিধি সোনাই। সে জীবনভর সুখের খোঁজ করতে গিয়ে ঘাটে-ঘাটে ভেসে বেড়িয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপে সোনাইদের ক্রমাগত পেশাগত রূপান্তরের যূপকাষ্টে বলি হতে হয়। সেলিম আল দীন মানুষের অন্তরলোকের গোপন কুঠুরিতে আলো ফেলে দেখিয়েছেন যে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অন্তর্জগতেই রয়েছে সুগভীর ক্ষত। তারপরও জীবন অসীম সম্ভাবনা নিয়ে হাতছানি দেয়। তাইতো সোনাই দুখাইপুরে গিয়ে সাপধরা শিখে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। *কেরামত মঙ্গল* নাটকটিও অসংখ্য ভাঙা মানুষের বঞ্চিত জীবনের হাহাকারের রূপভাষ্য। এই নাটকের বারোটি খণ্ডে কেরামত যে বারোটি নরকের গণ্ডিতে আবদ্ধ, তা আসলে পৃথিবীতে বিদ্যমান নরক রূপী হাজারো বৃত্তেরই রূপক। আর অনিকেত জীবনে সুখ-দুঃখ, আশ্রয়, প্রেমের মরীচিকায় প্রতিটি মানুষই এক একটি নারকীয় বৃত্তে আবদ্ধ। এই নাটকের শেষে কেরামত নিজেকে অন্ধ করে দেয়। সে হয়তো ভেবেছিল জীবনভর নানা অন্যায়ের সাক্ষী হয়েছে তার দুচোখ, সেই চোখ দুটো অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেই পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায় আচরণের সমাপ্তি ঘটবে। সুন্দর পৃথিবী আবারো মানবিক ও সাম্যের সোনারঙা আলোতে ভরে উঠবে। যাপিতজীবনের সব লেনদেন শেষ করে অন্ধত্বের বৃত্তে নিজেকে সমর্পন করে কেরামতও অন্তরে অন্তরিত থাকা সমুদ্রের ভেতরেই ডুব দিয়ে জীবনের মহত্ত্বটুকু উপলব্ধি করতে চেয়েছে। সবকিছুর পরেও জীবনের অবিরাম বহমানতাকে মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। তাইতো কেরামতও সফোক্লিসের রাজা *ইডিপাস* নাটকের ইডিপাসের মতো অন্ধকার বৃত্তে নতুন জীবনের সন্ধান খোঁজে। জীবনের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে নোনাজলের অদৃশ্য সমুদ্র গড়ে দিয়ে যায়, তা বহন করেও মানুষ আসলে পরের দিনের সূর্যের আলো প্রত্যাশী। *কিত্তনখোলা* নাটকে বনশ্রীবালা জীবনকে আমলকির ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের সঙ্গে তুলনা করেছিল। জীবনে সংগ্রাম, কষ্ট, অনিশ্চয়তা, প্রতারণার পাশাপাশি আনন্দ, প্রেম, নতুন করে বাঁচার আহ্বান আমলকির ত্রিস্বাদকেই মনে করিয়ে দেয়। সেই জীবনকেই মানুষের জয় করে নেওয়ার ধারাবাহিকতায় সৃজিত হয়েছে *হাত হদাই*।

সমুদ্র-তীরবর্তী জন-জীবনে সাগরভাসা এই সব মানুষেরা নিরাপদ আশ্রয়, প্রিয়জনের ভালোবাসা ও দু'মুঠো খাবারের নিশ্চয়তার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে চলে। জীবনভর দুখের বোঝা বয়ে চলা ভাঙা মানুষেরা বারবার সাগরের বান, তুমুল ঝড়-বৃষ্টি, চরের ভাঙনে বিপর্যস্ত হয়। চরাঞ্চলের প্রতিটি চরিত্রই অর্ন্তজগতে লালন করে গভীর বেদনাবোধ। সমুদ্রের উথাল-পাথালের সঙ্গে জন্ম থেকে পরিচিত মানুষেরা হৃদয়েও ধারণ করে এক একটা গভীরতর সমুদ্র। সেই অন্তর্জগতের সাগরেও ঝড় ওঠে, তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মন। কখনোবা কারো ভালোবাসায় সেই মনোজগতের শান্ত সাগরের তীরে মন ভিজে ওঠে। জীবন চলার পথে নিভৃত

১১. শেখর সমাদ্দার, 'একটি স্বর্গ, একটি মেলা-সাতটি নরক ও সাত সমুদ্রের নাট্যকথাকার', মফিদুল হক ও অরুণ সেন সম্পাদিত, সাত সওদা, সাহিত্য প্রকাশ, জুন ২০০৮, পৃ. ৩১

১২. আফসার আহমদ, মঞ্চের ট্রিলোজী ও অন্যান্য প্রবন্ধ, গ্রন্থিক প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২, পৃ. ৭২-১১২

অন্তর্জগতে প্রবাহিত সাগরের তীরে তীরে প্রতিটি বন্দরই মূল্যবান। তবে চাইলেই সব বন্দরে নোঙর করে সে দেশে স্থায়ী হওয়া যায় না। জীবনের বন্দরে বন্দরে নানা রকম বাণিজ্যের রঙবেরঙের খেলা মানুষের প্রাত্যহিত যাপনে অনিবার্য। মানুষ অনিকেত জীবনে নিত্য নতুন বন্দরে বাণিজ্যের পসরা নিয়ে সওদা করে ফেরে। নাট্যকারের ভাষ্যে, "ভাবগত দিক থেকে আঙ্কুরীর সঙ্গে আনার ভান্ডারির প্রণয়ও নানা বাণিজ্যের একটি। আরও বৃহৎ অর্থে নাটকের পাত্র-পাত্রীদের সবাই জীবন বাণিজ্যে লিপ্ত।[১৩]" *হাত হদাই* অর্থ সাত সওদা হলেও নাট্যকার অবশ্য বলেছেন যে, সমুদ্র ভ্রমণের সাত সাতটা গল্প খুঁজতে গেলে এই নাটকে তা পাওয়া যাবে না। বরং তিনি জীবন-বাণিজ্যের এক সুবিশাল ধারণা *হাত হদাই* নাটকে প্রয়োগ করেছেন। উপকূলের মানুষেরা জীবনসংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন বাণিজ্যে সমুদ্রের উত্তাল গর্জনের ভেতর দিয়েই বেঁচে থাকার স্বপ্ন বোনে। কেউ বা গভীর সমুদ্রে জীবনবাজি রেখে মাছ ধরে, বিক্রি করে; কেউ কেউ চর দখলের জন্য ভাড়ায় লাঠিয়াল হিসেবে মানুষ খুন করে, আবার কেউবা জাহাজে চাকরি নিয়ে সাত সমুদ্র ভ্রমণ শেষে চরে ফিরে দেখে জমি-বাড়ি নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। দিন শেষে সবার ভেতরেই হাহাকার জমতে থাকে। আবার কখনো স্বপ্ন ভেসে যায় নোনা জলে। যে মানুষেরা আপাতদৃষ্টিতে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভিনদেশের বন্দরে জাহাজ ভেড়াচ্ছে না তাদের জীবনেও অন্তর্লীন রয়েছে গভীর আরেক সাগর। সেই অর্থে হাস্না-চুক্কুনী-আঙ্কুরীও জীবনভর পাড়ি দিয়ে চলেছে তরঙ্গক্ষুব্ধ জীবন-সমুদ্র। মানব জীবনে নিরন্তরই চলেছে কেনা-বেচা। আর সেই সওদার কেনাবেচাতে হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রতিটি মানুষই পাড়ি দিয়ে চলেছে এক একটি তরঙ্গসংকুল গভীর সমুদ্র।

গ্রন্থপঞ্জি

১. *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৩, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।*
২. *অরুণ সেন, সেলিম আল দীন নাট্যকারের স্বদেশ ও সমগ্র, দুই বাংলার থিয়েটার প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০০০।*
৩. *আফসার আহমদ, মঞ্চের ট্রিলোজী ও অন্যান্য প্রবন্ধ, গ্রন্থিক প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।*
৪. *মফিদুল হক ও অরুণ সেন সম্পাদিত, সাত সওদা, সাহিত্য প্রকাশ, জুন ২০০৮।*
৫. *লুৎফর রহমান, বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক, নান্দনিক, প্রথম প্রকাশ, ২০১২।*
৬. *লুৎফর রহমান, কালের ভাষ্কর সেলিম আল দীন, রোদেলা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯।*

১৩. *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৩, পৃ. পরিশিষ্ট, কথাপুচ্ছ 'ক'*